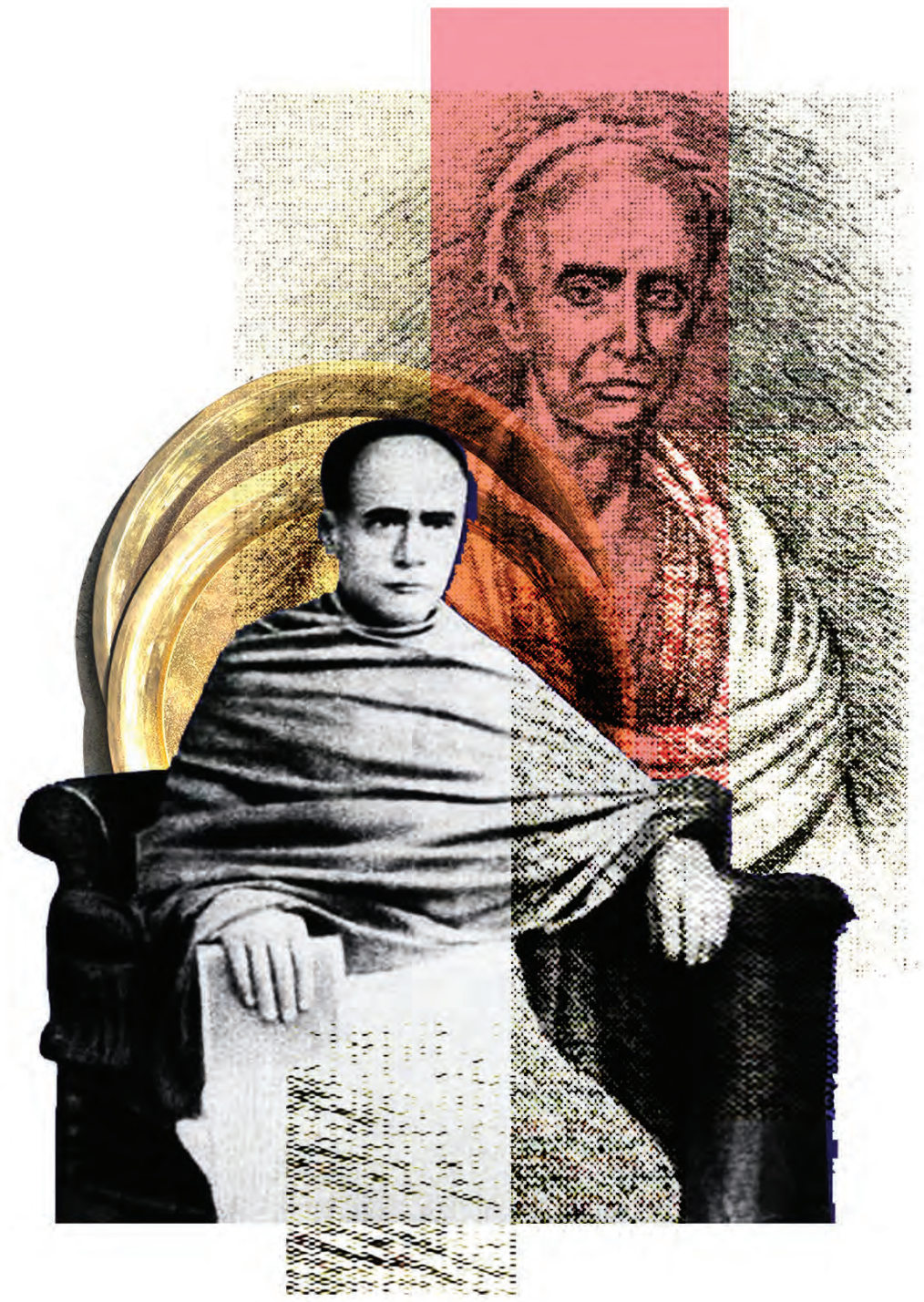

খিদের চোটে পিতলের থালা বিক্রি করতে গিয়েছিলেন বিদ্যাসাগরের পিতৃদেব?

আজ বিদ্যাসাগরের জন্মদিন। ঈশ্বর যখন জন্মেছিলেন, ঠাকুরদাস তখন কোথায়? **অরিন্দম ঘোষ**

ঠাকুরদাস গিয়েছেন কোমরগঞ্জ। মঙ্গলবারের হাটে। বাড়িতে উপস্থিত বিদ্যাসাগরের ঠাকুরদা রামজয় তর্কভূষণ। পুত্র ঠাকুরদাসকে সুসংবাদটা দেবেন বলে কোমরগঞ্জের দিকে হাঁটাপথ ধরলেন রামজয়। একটু এগোতেই দেখা হল ঠাকুরদাসের সঙ্গে। রামজয় কিন্তু সরাসরি কথাটা বললেন না। মজা করে বললেন, একটা এঁড়ে বাছুর হয়েছে। বাড়িতে তখন সত্যিই একটা গোরুর বাছুর হওয়ার কথা। তাই বাড়িতে এসেই ঠাকুরদাস চললেন গোয়ালঘরের দিকে। হেসে ফেললেন রামজয়। বললেন, ওদিকে নয়, এদিকে এসো। তোমাকে এঁড়ে বাছুর দেখাচ্ছি। ঠাকুরদাসকে নিয়ে অন্য ঘরে ঢুকে নবজাতককে দেখালেন রামজয়। তারপর বললেন, ও এঁড়ে বাছুরের মতো একগুঁয়ে হবে। ওর নাম রাখলাম ঈশ্বরচন্দ্র।

পরবর্তীকালে ঈশ্বরচন্দ্র এই ঘটনা সম্পর্কে লিখেছেন— 'আমি বাল্যকালে, মধ্যে মধ্যে অতিশয় অবাধ্য হইতাম। প্রহার ও তিরস্কার দ্বারা, পিতৃদেব আমার অবাধ্যতা দূর করিতে পারিতেন না। ঐ সময়ে তিনি সন্নিহিত ব্যক্তিদের নিকট, পিতামহাদেবের পূর্বোক্ত পরিহাসবাক্যের উল্লেখ করিয়া, বলিতেন, ইনি সেই এঁড়ে বাছুর বাবা পরিহাস করিয়াছিলেন, বটে কিন্তু, তিনি সাক্ষাৎ ঋষি ছিলেন তাহার পরিহাসবাক্যও বিফল হইবার নহে... সময়ে সময়ে কার্য দ্বারাও, এঁড়ে গরুর পূর্বোক্ত লক্ষণ, আমার আচরণে, বিলক্ষণ আবির্ভূত হইত।'

ঠাকুরদাসের কথায় ফেরা যাক। ঠাকুরদাসের যখন চোদ্দ-পনেরো বছর বয়স তখন তিনি ঠিক করেছিলেন কলকাতায় যাবেন। আসলে এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পেছনে একটা বড় কারণ ছিল। বিদ্যাসাগরের প্রপিতামহ ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ছিলেন বনমালিপুরের বাসিন্দা। তাঁর পাঁচ ছেলে। নৃসিংহরাম, গঙ্গাধর, রামজয়, পঞ্চানন ও রামচরণ। ভুবনেশ্বরের মৃত্যুর পর সংসারে কর্তৃত্ব করতে লাগলেন নৃসিংহরাম আর গঙ্গাধর। সামান্য বিষয় নিয়েই এদের সঙ্গে তর্কাতর্কি ও মনোমালিন্য শুরু হল রামজয়ের। দাদাদের অপমানসূচক কথাবার্তায় তিনি এতটাই দুঃখ পেলেন যে, কাউকে কিছু না বলে একদিন বাড়ি ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। সংসারে রেখে গেলেন স্ত্রী দুর্গাকে, তাঁর দুটি ছেলে, চারটি মেয়ে।

কিছুদিনের মধ্যেই লাঞ্ছনা আর অনাদর এমন পর্যায়ে পৌঁছল যে, দুর্গাদেবী আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে থাকতে পারলেন না সেখানে। শ্বশুরের ভিটে ছেড়ে তিনি চলে এলেন বীরসিংহ গ্রামে তাঁর বাবা উমাপতি তর্কসিদ্ধান্তের কাছে। উমাপতি বৃদ্ধ হয়েছেন, সংসারে কর্তৃত্ব করেন দুর্গাদেবীর ভাই আর ভাইয়ের বউ। সেখানেও কিছুদিন যাওয়ার পর দুর্গাদেবী বুঝতে পারলেন, যে তাঁরা ওখানে থাকায় তাঁর ভাই ও ভাইয়ের বউ খুশি নন। সেখানেও কথায় কথায় দুর্গাদেবীকে অপমানিত হতে হয়, উমাপতিকে জানিয়েও লাভ হয় না, কারণ সংসারে তাঁর কর্তৃত্ব আর খাটে না। ফলে যত দিন যায়, দুর্গাদেবী ও তাঁর ছেলেমেয়েদের অবস্থা আরও খারাপ হয়। শেষে উপায় না দেখে উমাপতি নিজের বাড়ির কাছাকাছি একটি কুঁড়েঘর বানিয়ে দিলেন দুর্গাদেবীকে। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে সেখানেই কষ্টে দিন কাটাতে লাগলেন দুর্গা। উমাপতি মাঝে মাঝে কিছু সাহায্য করতেন। অবস্থা এতটাই খারাপ হল যে, সুতো কাটতে লাগলেন দুর্গাদেবী। কিন্তু তা থেকে যে সামান্য আয় হত, তা এতটাই সামান্য যে তাতে তো আর সংসার চলে না। অবস্থা দেখে রামজয় আর দুর্গাদেবীর জ্যেষ্ঠপুত্র ঠাকুরদাস ঠিক করলেন তিনি কলকাতায় যাবেন, সেখানে কাজ করে টাকা রোজগার করবেন।

সেইমতো ঠাকুরদাস চলে এলেন কলকাতায়। উঠলেন তাঁদের আত্মীয় জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের বাড়িতে। আশ্রয় জুটল, কিন্তু কাজ? ঠাকুরদাস দেখলেন, মোটামুটি ইংরেজি শিখলেই সওদাগরি অফিসে কাজ পাওয়া সম্ভব। ইংরেজি শেখার ব্যবস্থাও জগন্মোহনই করে দিলেন তাঁর এক বন্ধুর কাছে। কিন্তু সেখানেও একটা সমস্যা শুরু হল। ঠাকুরদাস ইংরেজি শিখতে যেতেন সন্ধেবেলা। ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যেত। ততক্ষণে জগন্মোহনের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়ার পালা শেষ হয়ে যায়। ফলে দিনের পর দিন রাতে তাঁকে না খেয়েই থাকতে হত। অবশেষে উপায় না দেখে যাঁর কাছে ইংরেজি শিখতেন, তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নিলেন ঠাকুরদাস। কিন্তু এক সমস্যা যায় তো আরেক সমস্যা শুরু। যার বাড়িতে আশ্রয় নিলেন ঠাকুরদাস, সে ভদ্রলোকের আয় তেমন ভালো ছিল না। তার উপরে হঠাৎ সে ভদ্রলোকের অবস্থা আরও পড়ে যায়। ফলে সেখানেও কোনও দিন আধপেট, আবার কোনও দিন না খেয়েই দিন কাটত ঠাকুরদাসের।

একদিন তো খিদের চোটে নিজের একটা পিতলের থালা বিক্রি করতে গিয়েছিলেন ঠাকুরদাস। কিন্তু দোকানদাররা বলল, তাঁরা অচেনা লোকের কাছ থেকে কিছু কিনে ফ্যাসাদে পড়তে চায় না। ফলে সেদিনও অনাহারে থাকতে হল ঠাকুরদাসকে। আরেকদিনের কাহিনী তো আরও করুণ। খিদের জ্বালায় সেদিন রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন ঠাকুরদাস। ভেবেছিলেন, হাঁটলে হয়তো খিদের কথা ভুলে যাবেন। হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলেন বড়বাজার থেকে ঠনঠনিয়া। তারপরে অবস্থা এতটাই খারাপ হল যে, আর হাঁটতে পারেন না। দাঁড়িয়ে পড়লেন এক দোকানের সামনে। দোকানের এক মধ্যবয়সী মহিলা এমনটা দেখে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, দাঁড়িয়ে আছেন কেন?

ঠাকুরদাস একটু জল চাইলেন। মহিলাটি তাঁকে জল আর মুড়কি এনে দিলেন। খিদের জ্বালায় গোগ্রাসে খেতে লাগলেন ঠাকুরদাস। খাওয়া দেখেই মহিলাটি বুঝতে পারলেন, ঠাকুরদাসের সেদিন কিছুই খাওয়া হয়নি। তিনি আরও মুড়কি আর দই এনে পেট ভরে খাওয়ালেন ঠাকুরদাসকে। তারপর বললেন, যখনই দরকার হবে, এখানে এসে খেয়ে যেও। এর কিছুদিন পরেই অবশ্য একটা কাজ জুটল ঠাকুরদাসের। মাইনে দু-টাকা। সেই টাকাই ঠাকুরদাস পাঠাতে লাগলেন বাড়িতে। দু-তিন বছরের মধ্যেই তাঁর মাইনে বেড়ে হল পাঁচ টাকা।

এর মধ্যেই একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। ঠাকুরদাসের বাবা রামজয় তর্কভূষণ আবার সংসারে ফিরে এলেন। ফেরার কারণটাও অভিনব। কেদারনাথে থাকার সময় একরাতে দু-বার স্বপ্নাদেশ পেলেন রামজয়। শুনলেন কেউ তাঁকে বলছে, 'রামজয়, তুমি বৃথা কেন ভ্রমণ করিতেছ? স্বদেশে যাও, তোমার বংশে এক সুপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনি তোমার বংশের তিলক হইবেন।...তুমি পরিবারগণের নিকট প্রস্থান কর, আর বিলম্ব করিও না, তোমার প্রতি ঈশ্বর সদয় হইয়াছেন।'

ফিরেই রামজয় প্রথম গিয়েছিলেন বনমালিপুর। তারপর বীরসিংহে এসে তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা হল। এর কিছুদিন পর রামজয় গেলেন কলকাতায়। বড়বাজারের ধনী ভাগবতচরণ সিংহের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের সূত্রেই আরও বেশি মাইনের কাজ জুটল ঠাকুরদাসের। নতুন মাইনে হল আট টাকা। এরপর ঠাকুরদাসের যখন তেইশ-চব্বিশ বছর বয়স, তখন তাঁর বিয়ে হল গোঘাটের রামকান্ত তর্কবাগীশের ছোটমেয়ে ভগবতীর সঙ্গে।

১৮২০ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার। সেদিন দুপুরে বীরসিংহ গ্রামে জন্ম হয় ঠাকুরদাস ও ভগবতীর প্রথম সন্তান ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের। বীরসিংহ গ্রাম সে সময় হুগলি জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

অনেকদিন পরের কথা। ততদিনে বিদ্যাসাগরের নাম ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। তখন সকলে তাঁকে চেনেন। বিধবাবিবাহের বিরোধীরা ঠাকুরদাসকে বীরসিংহ গ্রামে বেশ বিরক্ত করত। সে খবর পৌঁছল কলকাতায় বিদ্যাসাগরের কাছে। বীরসিংহ গ্রামে এলেন জাহানাবাদের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। দেখা করলেন ঠাকুরদাসের সঙ্গে। বললেন, বিদ্যাসাগর মশাইয়ের কাছে শুনেছি, গ্রামের লোক আপনাকে বিরক্ত করে, আমাকে তাঁদের নাম বলুন। ঠাকুরদাস বললেন, আমার পুত্র কি শুনতে কি শুনেছে! ওর কথায় কাউকে কিছু বোলো না। গ্রামের সবার সঙ্গেই আমার বেশ সুসম্পর্ক আছে। তারপর গ্রামের লোকজনকে গোপনে খবর দিলেন ঠাকুরদাস, হাকিম কোথা থেকে খবর পেয়ে তোমাদের নাম জানতে চাইছেন। আমি কারোর নাম বলিনি। তোমরা বরং হাকিমের সামনে একবার আমার সঙ্গে দেখা করে যাও, তাহলেই আর কিছু হবে না। এমন বিরল স্বভাব ছিল ঠাকুরদাসের। তাঁকে বিরক্ত করছে জেনেও তিনি কাউকে বিপদে ফেলতে চাইতেন না।

ঠাকুরদাস তখন কাশীবাসী। সেখানে দেখা করতে গেলেন বিদ্যাসাগর। ঈশ্বর নিজেই যেতেন বাজারে। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলতেন, বাবার জন্য বাজার করে সুখ পাই। যদি কাজে ব্যস্ত না থাকতাম, তবে আমি সবসময় তাঁর সেবা করে ধন্য হতাম।

১৮৭৬ সালের ১২ এপ্রিল কাশীতেই সূর্যাস্তের সময় মৃত্যু হয় ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাঁর প্রয়াণে সেদিন যেন দুবার সূর্যাস্ত হয়েছিল।

গ্রামের লোকজনকে গোপনে খবর দিলেন ঠাকুরদাস, হাকিম কোথা থেকে **খবর পেয়ে তোমাদের নাম জানতে চাইছেন। আমি কারোর নাম বলিনি। তোমরা বরং হাকিমের সামনে একবার** আমার সঙ্গে দেখা করে যাও, তাহলেই আর কিছু হবে না।

কুমোরপাড়া আছে, পেটে ভাত নেই বংশীবদনদের

সংকটে কুম্ভকাররা, বাধ্য হচ্ছেন পেশা পরিবর্তনে। **সনাতন পাল**

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'হাট' কবিতায় লিখেছিলেন, 'কুমোর পাড়ার গোরুর গাড়ি/ বোঝাই করা কলসি হাঁড়ি।/ গাড়ি চালায় বংশীবদন,/ সঙ্গে যে যায় ভাগ্নে মদন।'

এখন আর এমন দৃশ্য দেখা যায় না। আগে মাটির হাঁড়ি, কলসি, গ্লাস, ভাঁড়, সরা, জলের কুঁজো, ঘট, গাছা, প্রদীপ, গোরুর খাবারের জন্য চারি--এসবের খুব প্রচলন ছিল। সেই সময়ে কুমোররা গোরুর গাড়ি বোঝাই করে মাটির বাসন হাটে বিক্রি করতে নিয়ে যেত। এখন আর এসবের খুব একটা প্রচলন দেখা যায় না, তাই সেই দৃশ্যটাও অদৃশ্য হয়ে গেছে। এখন হয়তো শ্রাদ্ধ বাড়িতে, বিয়ে বাড়িতে সামান্য কিছু মাটির জিনিসের ব্যবহার দেখা যায়— পুজোতেও যৎ সামান্য। পৌষপার্বণের সময় মাটির সরা, কালীপুজোর সময় কিছু মাটির প্রদীপের প্রচলন রয়েছে। পাশাপাশি কলকাতায় গেলে এখনও মাটির ভাঁড়ে চা খাওয়ার চল লক্ষ্য করা যায়। তবে দইয়ের ক্ষেত্রেও মাটির হাঁড়ি প্রচলন আছে, কিন্তু এখানেও কমে গেছে— কারণ বেশির ভাগ বাড়িতে ঘরে পাতা দই চলে। কিন্তু পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন এলাকায় যত সংখ্যক কুমোর রয়েছেন, তাঁদের এই যৎ সামান্য জিনিস বিক্রি করে সংসারের চাহিদা মেটে না। কয়েক বছর আগেও মানুষ পেটের সমস্যার জন্য মাটির হাঁড়িতে খরির উনুনে রান্না করা ভাত খেতেন। এছাড়াও সস্তায় পাওয়া যেত বলে গরিব মানুষরা মাটির উনুনে ভাত রান্না করতেন। মাটির কড়াইয়ে তরকারি রান্না করতেন, মাটির কলসিতে জল রেখে তা মাটির গ্লাসে ঢেলে খেতেন। পাশাপাশি মধ্যবিত্তরাও নানাবিধ উপকারের কারণে মাটির হাঁড়ি পাতিল ব্যবহার করতেন। গরমের সময় জল ঠান্ডা রেখে খাওয়ার জন্য মাটির কুঁজো ব্যবহার করতেন। অনেকের পেটে গ্যাস অম্বলের সমস্যা থাকলে মাটির পাতিলে রান্না করা ভাত খেতেন। এখন আর সে সবের বালাই নেই। এখন ঘরে ঘরে ফ্রিজ। সেই ফ্রিজে জল রেখে ঠান্ডা করে তার সঙ্গে সাধারণ জল মিশিয়ে খাচ্ছেন, তাই আর কুঁজো বিক্রি হয় না। সিলভারের হাঁড়ির টেকসই মাটির হাঁড়ির ঢের ঢের বেশি। ব্যবহার করাও সুবিধা। তাই এখন মানুষ সিলভারের হাঁড়িতেই ভাত রান্না করেন। ভাত রান্নার হাঁড়ি আর বিক্রি হয় না। স্টিলের থালা, কাচের গ্লাস, কাচ এবং স্টিলের গ্লাস-বাটি মানুষ এখন ব্যবহার করছেন, ফলে মাটির তৈরি এসব জিনিস আর বিক্রি হয় না। পলিথিনে মাটি এবং পরিবেশ দূষণের যথেষ্ট কারণ থাকা সত্ত্বেও পলিথিনের যথেষ্ট ব্যবহার রয়েছে। বর্তমানে মিষ্টির দোকানে মাটির হাঁড়ির পরিবর্তে পলিথিনের ব্যাগ ব্যবহার হচ্ছে, ফলে এখানেও আর মাটির হাঁড়ির চাহিদা নেই। এসব নানাবিধ কারণে মাটির জিনিসের উৎপাদনের ব্যবস্থা যথেষ্ট থাকলেও চাহিদা খুবই যৎ সামান্য— প্রায় নেই বললেই চলে। কিন্তু বৃহৎ জনসংখ্যার কুমোর গোষ্ঠীকে জীবিকা নির্বাহ করতে এই সামান্য মাটির বাসন বিক্রি করে সংসার চলবে না। তাছাড়া মাটির বাসন তৈরিতে অন্য সমস্যাও রয়েছে। তা হল— এঁটেল মাটি ছাড়া হাঁড়ি তৈরি হয় না। এক ঠ্যালা এই মাটি নিয়ে আসতে ৩০০-৪০০ টাকা এবং এক ঠ্যালা বালি কিনতে প্রায় ২০০ টাকা খরচ হয়। এর সঙ্গে সবচেয়ে বেশি যেটা খরচ, তা হল হাঁড়ি পোড়ানোর জন্য ব্যবহৃত খরি। এক কুইন্টাল খরির দাম ১০০০ টাকা, সঙ্গে আরও অনেক আনুষঙ্গিক খরচ রয়েছে। মোট খরচের পরে ওই এক ঠ্যালা মাটি থেকে যতটুকু বাসন পাওয়া যাবে, সেটা বাজারে বেচলে কোনও রকমে খরচের সঙ্গে হয়তো সেদ্ধ ভাত জুটবে— কিন্তু ডাল-ভাত জুটবে না। আবার এই সামান্য বাসন বিক্রি হতেও অনেকটা সময় লাগে। কিন্তু পেট তো আর অতদিন বসে থাকবে না। এই অবস্থায় কুমোরদের যে জীবিকা সংকট তৈরি হচ্ছে, তার কারণে আজকাল প্রায় ৯৯ শতাংশ কুমোরই অন্য পেশায় চলে গেছে। শুধু মালদা জেলার ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা গেছে বাচামারী এলাকার কয়েকশো কুমোর বাড়ি— ধান কিনে তা চাল তৈরি করে বেচার ব্যবসা করতেন। কিন্তু কয়েক বছর হল সে ব্যবসাও আর নেই। কেউ কেউ বিভিন্ন দোকান করেছেন, আবার কেউ ভিন রাজ্যে পাড়ি দিয়ে পরিযায়ী খেতাব পেয়েছেন। শুধু মালদা কেন, কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ একই দৃশ্য। বালুরঘাটে ২-৩টি পরিবার বাদে সবাই অন্য পেশায় চলে গেছেন। এই যে ২-৩টি পরিবার রয়েছে সেই পরিবারের সবাই এই পেশায় যুক্ত নয়—সঙ্গে অন্য কাজও করেন। তবে এই কাজ ভীষণ কষ্টের, সেই কারণে প্রায় কোনও কুমোরই চান না যে তাঁর সন্তান এই মাটি সানা পেশার সঙ্গে যুক্ত হোক। কুমোরদের এই করুণ পরিণতি থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার। সভ্যতা, প্রযুক্তির উন্নতি যেমন মানুষকে অনেকটা সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে, তেমনি কিছু মানুষকে জীবিকা সংকটেও ফেলেছে। তাই প্রযুক্তির ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে তার উলটো দিকটাও ভাবনার মধ্যে রাখা দরকার। তা না হলে সমাজে নিত্য-নতুন সমস্যা দেখা দেবে। যখন টোটো আবিষ্কার হল তখন রিকশা চালকরা সমস্যায় পড়েছিলেন। তারপরে বেশির ভাগ রিকশা চালকরা টোটো চালকে পরিণত হয়েছেন, তবে সবাই নয়। এখনও কিছু রিকশা চালক সমস্যার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। কিন্তু কুমোররা কেউ সিলভারের হাঁড়ি তৈরির কাজ শুরু করেছেন বলে একটি উদাহরণও এই নিবন্ধকারের জানা নেই। হয়তো একটা সময় আসবে, যখন মানুষ বাংলার মৃৎশিল্পকে লুপ্তপ্রায় কুটীর শিল্পের ইতিহাস হিসেবে জানবে। সবচেয়ে খারাপ লাগে, এমন একটা স্বাধীন জীবিকার মানুষরা আজকে অনেকেই পরাধীন জীবিকার উপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য হয়েছেন। সংবেদনশীল পাঠক, একবার ওই মানুষগুলোর মানসিক কষ্টটা উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন, বুঝতে পারবেন। আমরা হয়তো তাঁদের জন্য তেমন কিছুই করতে পারব না, তবু তাঁদের দুঃখে সমব্যথী তো হতে পারব। এই সহমর্মিতার নামই তো সামাজিকতা।